সায়ন্তনী পৃতুন্ড

রাজনের রসিকতা

boierpathshala.blogspot.com

রাজনের রসিকতা || সায়ন্তনী পূততুন্ড

হর এক বাত পে পুছো তুম কে, 'তু কেয়া হ্যায়?'
তুম হি কহো ইয়ে আন্দাজ়-এ-গুফতগু কেয়া হ্যায়?
রগোঁ মেঁ দৌড়নে ফিরনে কা হম নেহি কায়ল
জব আঁখ হি সে না টপকা, তো ফির লহু কেয়া হ্যায়!

মির্জ়া গালিব আমার বড় প্রিয়।

তার নাম ছিল রাজন। রাজন মানে, ছেলেমানুষি। রাজন মানে, একটা দামাল হাসি। রাজন মানে, অনাড়ম্বর সারল্য, আর মারাত্মক সেন্স অফ হিউমার!

রসিকতা করতে তার জুড়ি মেলা ভার। আর কথায়-কথায় হা-হা, হো-হো করে রীতিমতো কয়েক মাইল লম্বা একখানা মেগাহাসি দেওয়া তার স্বভাব। সকাল-বিকেল যোগব্যায়াম করতে-করতে আফসোস করত, "হে ভগবান, কেন যোগগুরু হলুম না? সুন্দরীদের সামনে ধুতি পরে শীর্ষাসন করার সুখটা এ জন্মের মতো ফসকে গেল!"

ভাগ্যিস ভগবান ওর কথায় কর্ণপাত করেননি! করলে, ওকে পেতাম কোথায়? নিপাট ব্রহ্মচারীর জীবনে কি আমার মতো খেঁদি-পেঁচিরা শোভা পায়? যাই হোক যোগগুরু না হওয়ার দরুন একদিন আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েই গেল। দিনটা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। চশমার পাওয়ার বেড়েছে। কিন্তু আজও সেই দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে চশমার প্রয়োজন হয় না।

আমাদের পাড়ার বিজয়া সম্মিলনীর সঙ্গীতানুষ্ঠান... তখনও পাড়ার অনুষ্ঠানে পেশাদার শিল্পীদের বাজারি গানের রমরমা হয়নি। পরিচিত কাকু-কাকিমা, দাদা-বউদিরাই স্টেজ আলো করতেন। হাপু গান, কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে 'আর কত রাত একা থাকব', সবই চলত।

boierpathshala.blogspot.com

তবে এই ধরনের প্রোগ্রামের কিছু সমস্যাও আছে। কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা একবার মাইক ধরলে সহজে ছাড়েন না। তেমনই একজন ছিলেন আমাদের পাড়ার দাসকাকু! এমনিতে মানুষ ভাল, কিন্তু তাঁর একটিই মহত্ দোষ, স্টেজে উঠলে কিছুতেই নামার নাম নেন না। উদ্যোক্তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রতিবছর মাথার চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে যে উদ্যোক্তাদের কতজনের 'মেঘে ঢাকা তারা' শেষপর্যন্ত 'অবাক পৃথিবী' হয়ে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। দর্শকরাও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন... অথচ গায়কের সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই। দর্শকদের কুইনাইন গেলার মতো মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবেন, 'সবই মায়া! বাস্তব শুধু এই অ-মাইক গলা ও হারমোনিয়াম!'

সেবারও তিনি গাইতে উঠেছেন। গানটা আক্ষরিক অর্থে শেষ হয়ে গিয়েছে। তবু ক্রিজ় ছাড়ছেন না দাসকাকু। রিপিট করেই যাচ্ছেন, "সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা... ঝুলনা... ঝুলনা..." হারমোনিয়াম হাড়-পাঁজর বের করে কেঁউ-কেঁউ করছে। দর্শক ও শ্রোতারা যথারীতি প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডাকছেন। উদ্যোক্তারা ইশারা করে গান থামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের মূকাভিনয়ে বিশেষ কাজ দিল না। বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে তাঁরাও বোধ হয় পরম করুণাময়কেই স্মরণ করতে বসলেন। ওদিকে তখনও রেকারিং ডেসিমালের মতো চলছে, 'ঝুলনা... ঝুলনা... ঝুলনা...'

সকলেই যখন প্রায় ভগ্নাবশেষের মতো থ হয়ে বসে আছে, আর উদ্যোক্তারা মগ্ন মৈনাক হওয়ার ফিকির করছেন... ঠিক তখনই সামনের সারি থেকে এক সুদর্শন তরুণ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। কথা নেই, বার্তা নেই, এক্কেবারে ব্যারিটোন ভলিউমে বলে উঠল, "কাকু, আর কত ঝুলবেন? এবার নেমে আসুন। বাদবাকিদেরও ঝুলতে দিন!"

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে পিন ড্রপ সাইলেন্স! দাসকাকু অমন বাজখাঁই গলার ধাক্কায় ঘাবড়ে গিয়ে থেমে গেলেন। ঝোলাঝুলি বন্ধ হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় জনতা স্তম্ভিত। সকলে হাঁ করে ছেলেটার দিকেই দেখছে। কী অসীম সাহস! অবলীলায় কথাগুলো বলে আবার মিটমিট করে হাসছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই শুনলাম বাবা বিড়বিড় করছেন, "ওহ্ ঈশ্বর! এতক্ষণে আমাদের প্রার্থনা তোমার কানে গেল! তা দেবদূতটি কে? চিনলাম না তো।"

boierpathshala.blogspot.com

বলাই বাহুল্য এই দেবদূতটির সঙ্গে পরে আমার আলাপ হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেকেই তাকে হাড়ে-হাড়ে চিনেছিলাম।

ওর ভাল নাম সম্রাট। তবে রাজা বা রাজন নামেই সে বিখ্যাত ছিল। ভয়ানক ডাকাবুকো। বাইক র্যালিতে ওর সঙ্গে এঁটে ওঠা শুধু কষ্টকরই নয়, একরকম অসম্ভব। বাইককে আবার 'বাইক' বললে সে রেগে যেত। তার বাইকের নাম ছিল মিস্টার গোম্স। তার পিঠে চাপলে, সে নিজেকে আর্নল্ড শোয়ার্ত্জেনেগার ভাবত।

বিজয়া সম্মিলনীর ঘটনার পর দাদার সঙ্গে তার ভালই দোস্তি হয়ে গেল। 'রিশ্তা' তখনও হয়নি। তাই আমরা 'রিশতেদার'-এর বদলে তখনকার মতো 'দোস্তিদার' হয়ে দাঁড়ালাম। প্রথমদিন দাদা যখন তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এল, সেদিনই কাছ থেকে ভাল করে দেখলাম তাকে। আপাতদৃষ্টিতে বেশ রাগী মনে হয়। চোখদু'টোও বেশ রাগী-রাগী। অথচ যখন হো-হো করে হাসতে শুরু করল, তখন বোঝা যায় তার মধ্যে কোথাও একটা অদ্ভুত সারল্য আছে।

দেখলাম, সে হাসি আর কিছুতেই থামতে চাইছে না এবং হাসিটা বেশ অপ্রকৃতিস্থ। রাজনের একটু পানদোষ ছিল। তেমন মারাত্মক না হলেও, সে মাঝেমধ্যে বন্ধুদের খপ্পরে পড়ে মাতাল হয়ে যেত। তখন তাকে সামলানো যেত না। তেমনই কিছু একটা হয়ে থাকবে আন্দাজ করে দাদা সভয়ে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, রাজা? হাসছিস কেন?"

রাজন হাসতে-হাসতেই বলল, "রাজা কি এখানে আছে?"

পালটা প্রশ্ন শুনে সকলেরই আক্কেল গুড়ুম! যে লোক নিজেকে নিজেই খুঁজছে, তাকে কি কিছু বলা যায়? এ আবার কী? আইডেন্টিটি ক্রাইসিস? নাকি জ্যাকি চ্যানের 'হু অ্যাম আই'-এর নিপাট বাঙালি সংস্করণ?

দাদা কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "না এখানে তো... নেই। কেন?"

তখনই শুরু হল হাউহাউ করে কান্না। সে কী কান্না! রাবণও বোধ হয় রামের তিরের খোঁচা খেয়ে দশ মাথায় অমন কয়েকশো ডেসিবেল কাঁদেনি। দাদা ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "কেন? কী হয়েছে?"

boierpathshala.blogspot.com

“শালা, আমার মিস্টার গোম্সের চাবি নিয়ে চলে গিয়েছে। আমি এখন কী করি?”

“কোন শালা নিয়ে গিয়েছে?”

“রাজা! রাজার কথাই তো বলছি।”

আমরা সকলেই প্র্যাকটিক্যালি বর্গীয় জ-এর মতো দশাপ্রাপ্ত হয়ে ওর কথা শুনছি। মনে হচ্ছিল, ইলেকট্রিকের তারে আধখানা চাঁদ নয়, রাশি-রাশি বিস্ময়সূচক চিহ্ন আর প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে আছে। চতুর্দিক দিয়ে কনফিউশন শিং উঁচিয়ে তাড়া করছে।

আর আমরা সকলে চণ্ডীদাসের মতো ‘রাজার কি হইল অন্তরে ব্যথা’ শুধোবার জন্য আকুল উঠছি।

দাদাই প্রথমে সামলে নিয়ে বলল, “আচ্ছা, তা আপনি কে?”

কান্না-মেশানো গলায় উত্তর এল, “আমি ঔরঙ্গজেব।” সেদিন সে নাট্যোত্সব দেখে ফিরছিল। সম্ভবত ঔরঙ্গজেব দেখে থাকবে আর সেটাই তার মাথায় ঢুকেছে।

দাদাও বেশ রসিক মানুষ। হাসি চেপে বলল, “বেশ, তা এত রাতে আর কোথায় যাবেন, জাঁহাপনা? ভিতরে আসা হোক।”

রাজন ঢুকতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। দাদা তাকে জাপটে ধরতেই সে অবাক হয়ে বলল, “আপনি কে?”

দাদা আরও গম্ভীর হয়ে বলল, “আমি শাজাহান, তোর বাপ!”

পরদিন সকালে জাঁহাপনা যে মহা ধর্মসংকটে আর প্রভূত লজ্জায় পড়েছিলেন, তা আর না বললেও চলে। এরপর আর কখনও তাকে মাতাল অবস্থায় দেখিনি। অন্তত দীর্ঘ একদশকের সম্পর্কে তো নয়ই।

রাজনের আরও একটা মহান দোষ ছিল। সে অসম্ভব ভুলে যেত। ভুলে গিয়ে এমন সব কাণ্ড বোধ হয় নেই, যা সে করেনি। নাতিদীর্ঘ জীবনে এমন অনেক ঘটনাই সে ঘটিয়েছে, যার যুক্তি খুঁজে বের করার চেয়ে হাতিকে জাঙ্গিয়া পরানো অনেক সহজ কাজ। দু’পায়ে দু’রকম চপ্পল পরা, গেঞ্জির জায়গায় ভাইঝির টেপজামা পরে বেরিয়ে যাওয়া, সানগ্লাস কপালের উপর তুলে রেখে হন্যে হয়ে সেটাই খুঁজে বেড়ানো... এসব তো নিতান্তই কমন!

boierpathshala.blogspot.com

সবচেয়ে ভয়াবহ কাজ যেটা করেছিল, সেটা ওর মুখেই শোনা।

একবার অফিস যাওয়ার পথে হঠাত্ রাজনের মনে হয়, ওর ট্রাউজ়ারটা বারবার নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আমার দাদা তার সঙ্গেই অফিসে যেত। কিছুক্ষণ উসখুস করার পর আর থাকতে না পেরে সে দাদাকে বলেই ফেলল, "বাবু, দ্যাখ তো, আমার ট্রাউজ়ারটা কি নেমে যাচ্ছে?"

দাদা একঝলক দেখে নিয়ে বলে, "না, ঠিকই আছে।"

সে আর কোনও কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেল। কিন্তু অস্বস্তি ক্রমশ বাড়তেই থাকল। শুধু মনে হচ্ছে, ট্রাউজ়ারটা কোমর থেকে খুলে যাচ্ছে। অথচ সেটা আছে যথাস্থানেই। আবার মনে হচ্ছে, নেই!

বাধ্য হয়ে অফিসে ঢুকেই পড়িমরি করে টয়লেটে দৌড়তে হল। আর তখনই রহস্যের পরদা ফাঁস! মহারাজ সকালে উঠে পাজামা খুলতে ভুলে গিয়েছেন এবং তার উপরেই প্যান্ট গলিয়ে চলে এসেছেন। যে-কোনও কারণেই হোক, পাজামার দড়ি খুলে যায় আর সেটা ক্রমাগত নীচে নেমে যেতে থাকে। ট্রাউজ়ার নয়।

এমনই একটি মানুষের প্রেমে পড়া মানে রীতিমতো চিত্রনাট্যে কঙ্কালের রোল করা। কিছুতেই বত্রিশ পাটি মুখের ভিতরে রাখার উপায় নেই। যতই ঠোঁট দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করো, বেয়াদবরা ঠিক তাল বুঝে একেবারে আকর্ণ বিস্তৃত ক্রিজ়ে লাফিয়ে পড়বেই। বলাই বাহুল্য সেই কঙ্কালের রোলটা আমাকেই করতে হয়েছিল। শীতকালে কঙ্কালদের যে কী পরিমাণ কষ্ট হয়, তা বোধ হয় একমাত্র আমিই বুঝেছিলাম। বেচারাদের জন্য আমার সহানুভূতি রইল।

রাজনের সেন্স অফ হিউমারের কথা মনে পড়লে এখনও হাসি পেয়ে যায়। কথায়-কথায় ফোড়ন কাটা ওর স্পেশ্যালিটি। সে ফোড়ন কী জাতীয় ছিল, তার উদাহরণও দিয়ে রাখলাম। প্রত্যেক সকালে ওর ঘুম ভাঙত পাশের বাড়ির কেদারবাবুর নাক ঝাড়ার শব্দে। বালিশে কান ঢেকেও শান্তি নেই। নাক ঝাড়ার ভয়াবহ আওয়াজ কিছুতেই পিছন ছাড়ে না। আর সে শব্দও এমন যে, ভয় হয়, এই বুঝি আস্ত নাকটাই ভদ্রলোকের হাতে খুলে চলে এল।

boierpathshala.blogspot.com

বাধ্য হয়েই ঘুমচোখে বাইরে বেরিয়ে তার ডায়লগ, “দাদা, খোঁজাখুঁজি তো চলছে জোরকদমে... গুপ্তধন কিছু পেলেন?”

সেই ঘটনার পর থেকেই নাক ঝাড়ার আওয়াজ একেবারেই বন্ধ। কে জানে, হয়তো ভদ্রলোক আশঙ্কা করে বসলেন যে, গুপ্তধন পেলে ছোঁড়া তার অর্ধেকটাও দাবি করে বসতে পারে। ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই!

যেদিন থেকে রাজন সেলফোন কিনেছে, সেদিন থেকেই আর-এক জ্বালাতন শুরু হয়েছে। থেকে-থেকেই গোস্ট কল আসে। একদিন দেখি ফোনে কাকে যেন বিড়বিড় করে বলছে, “বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ...”

মনে-মনে ভাবলাম, হল কী! একটা অজানা ভয় যে লাগেনি, তা নয়। বিশেষ করে ঔরঙ্গজেব কাণ্ডের পর ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। গতবার নিজেকে ঔরঙ্গজেব ভেবেছিলেন। এবার যে নিজেকে বেণীমাধব শীল ভাবছেন না, তার গ্যারান্টি কী?

সে আশঙ্কা রাজন নিজেই কাটিয়ে দেয়। ফোনটা কেটে দিয়ে হেসে বলে, “বুঝলে, আমাকে রোজ এক মহিলা ফোন করে ইংরেজি মাসের নাম শেখান। কোনও কথা নেই, খালি জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল... বারোটা মাসের নাম গড়গড় করে বলে যান। প্রথমে বিরক্ত হয়ে কেটে দিয়েছি। যতবার কেটে দিই, মহিলা কিছুতেই হাল ছাড়েন না। আজ ভাবলাম, আমিও ওকে একটু বাংলা মাসের নাম শিখিয়ে দিই। কিন্তু সেটা বোধ হয় ওঁর বিশেষ পছন্দ হয়নি। তাই আজ নিজে থেকেই ফোনটা কেটে দিলেন।”

আমাদের সম্পর্ক প্রায় দশবছরের। কেউই কাউকে কিছু বলিনি। আমি বুঝেছিলাম, সাহেব ভালই হাবুডুবু খাচ্ছেন। ওদিকে সাহেবও বুঝেছিলেন, তাকে আমি বেশ ভালই লাই দিচ্ছি। প্রেমে শুনেছি, লোকে চোখে অন্ধকার দেখে। লাভ ইজ় ব্লাইন্ড। আমার ক্ষেত্রে সবই উলটো। ব্লাইন্ড হওয়ার বদলে বরং নিজের চোখের উপরে আরও একজোড়া চোখের আমদানি হয়েছিল, চশমা। রাজনও অন্ধ হয়নি, বরং একটু বেশিই চক্ষুষ্মান হয়েছিল। বলা ভাল যে, ওর চোখ একটু বেশিই খুলে গিয়েছিল। মাঝেমধ্যে সেই খোলা চোখ সুন্দরী মেয়ে দেখলেই কপালে উঠে যেত বটে, কিন্তু আমার চারচোখের কটমটে পাঞ্চে আবার যথাস্থানে ফিরেও

boierpathshala.blogspot.com

আসত।

‘প্রেম’ শব্দটা ভারী মজাদার। শব্দ একটাই, কিন্তু তার এক-একটা রং এক-একরকমের। কখনও মনে হত স্নেহ, কখনও বা পুরোদস্তুর গার্জেনগিরি। কখনও কট্টর সমালোচক, আবার কখনও বা অন্ধ সাপোর্টার।

আমার আবার একটু কবিতা লেখার শখ ছিল। রাজন কবিতা লিখত না। কবিতায় ওর ভয়ানক অ্যালার্জি। অথচ জ্ঞান দেওয়ার সময় একেবারে জ্ঞানদারঞ্জন শর্মা। আমার কবিতা পড়ে বলত, “কী যে লেখো! সবই তো বুঝতে পারি।”

এরকম ভয়ংকর মন্তব্যের উত্তরে কী বলব ভেবে পেতাম না। তখনই শুরু হত কবিতা বিষয়ে জ্ঞান, “কবিতা এত সহজে বুঝলে কী করে চলবে? এমন কবিতা লিখতে হবে যার প্রত্যেকটা শব্দই বাংলা। কিন্তু একসঙ্গে পড়লে মনে হবে, ফ্রেঞ্চ পড়ছি। পাবলিক একবার সোজা করে পড়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু কোনওভাবেই বুঝতে পারবে না। লোকে গলগল করে ঘামবে, হাত-পায়ের সমস্ত নখ চিবিয়েও যখন মাথামুন্ডু-ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝবে না, তখনই বিগলিত হয়ে বলবে, ‘কী চমত্কার কবিতা! মানে না বুঝলেও সেটা ধাক্কা দিয়ে গেল।’”

আমি তো হাঁ। পরক্ষণে হেসে নিজেই যোগ করে, “সে ধাক্কা যে কনফিউশনের ধাক্কা, সে কথা আর কে বলে।”

বোঝো! কী এক্সপ্ল্যানেশন!

আবার উলটো প্রতিক্রিয়াও দেখেছি কখনও-কখনও। একসময় ব্রজবুলি নিয়ে খুব উত্সাহিত হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে ভানুদাদাকে পর্যন্ত চারশো চল্লিশ ভোল্ট লাগিয়ে ছাড়ব। প্রায় দাঁত কিড়মিড় করেই ব্রজবুলির গুষ্টির পিণ্ডি দিতে উদ্যত হয়েছিলাম। বেশ ভারী-ভারী গালভরা পদ মুখস্থ কর ঘুরে বেড়াচ্ছি। সবসময় মনে একটা ‘কাকে দিই, কাকে দিই’ ভাব।

আমার খুড়তুতো দাদা সেসব শুনে বলেছিলেন, “এগুলো ব্যাকডেটেড। কাজ করে লাভ নেই।”

আমার মুখে হয়তো হতাশার ছাপ পড়ে থাকবে। সেটা লক্ষ করেই রাজন আমার মাথায় হাত

boierpathshala.blogspot.com

বুলিয়ে হেসে দাদাকে বলে, “তা ঠিক। তবে ব্রজবুলির চেয়েও ব্যাকডেটেড জিনিস ডাইনোসর। তবু স্পিলবার্গ জুরাসিক পার্ক ছবিটা করেছিলেন।”

আমায় উত্সাহ দেওয়ার জন্য ওই একটা মানুষ সবসময় তৈরি থাকত। রাতের পর-রাত জেগে কবিতা শুনেছে। যত ক্লান্তিই থাকুক না কেন, তার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিনি কখনও। সেসব কবিতা শুনলে কবিরা ‘আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান,’ বলে শহিদ মিনার থেকে লাফ মারতেন, এমন অনেক কবিতা লিখে ফেলে দিয়েছি। ও তুলে জমিয়ে রেখেছে। হতাশ হয়ে পড়লে বুঝিয়েছে। দুঃখ পেলে সস্নেহে, সপ্রেমে ভুলিয়েছে।

আবার পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়াও করেছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও গান প্রসঙ্গে রাজার ধারণা, “ওহ্, লোকটা যে কী সব মিনমিনে গান লিখেছে! কথাবার্তাও পাক্কা ঘটিমার্কা। কী যে ‘এলুম, গেলুম, হালুম-হুলুম’ লেখে। এভাবে ভাবনার প্রকাশ হয়? বাঙালদের দ্যাখো। খেয়ে উঠে বলবে, ‘খা-ই-লা-আ-আ-ম’। বেশ বোঝা যায় যে, তৃপ্তি সহকারে খেয়েছে। তোমার রবিঠাকুর বলবেন, ‘খেলুম’। ওইটুকু একটা এক্সপ্রেশন! বোঝাই গেল না, পেট ভরল কি না!”

রাজন এরকমই ছিল। কর্মসূত্রে দিল্লি যাওয়ার আগে হঠাত্ আমাকে একটা নতুন কেনা সেলফোন ধরিয়ে দিয়ে বলল, “তা হলে ওই কথাই রইল। তুমি আমাকে বে করছ।”

কথাটার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, “সে কী! এমন কথা কবে হল?”

মুচকি-মুচকি হেসে বলেছিল, “করবে না, এমন কথাও তো হয়নি।”

আমার মুখ দেখে পেটেন্ট অট্টহাসি হেসে বলেছিল, “ফোনটা রাখো। রোজ ফোন করব, কবিতা শুনব। কথা রইল।”

কথা রেখেছিল রাজন। রোজ ফোন করত। পাঁচ-দশমিনিট কথা হত। কবিতা শুনত। নতুন কী লিখেছি, জানতে চাইত। তবে যাকে বলে, ‘প্রেমে গদগদ ভাষণ’, তা আমরা কেউই করতাম না। কথোপকথনের বেশিরভাগটাই জুড়ে থাকত জরুরি অথচ আন্তরিক কথা।

এরকম একদিনই ফোন করে কেস খেয়েছিল রাজন। সেদিন আমি স্নানে গিয়েছি। ফোনটা বাজছে দেখে বাবা রিসিভ করেন। রাজন আশা করেনি, বাবা ফোনটা ধরবেন বা ধরতে

boierpathshala.blogspot.com

পারেন। সে বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কোনওমতে গলা পালটে বলে, “হ্যালো, টিকিপিসি আছেন?”

আমার বাবা দুষ্টুবুদ্ধিতে ওরও বাবা। হেসে বলেন, “না, টিকিপিসি স্নানে গিয়েছেন। তুমি বরং ততক্ষণ টেকোপিসোর সঙ্গে কথা বলো, রাজা।”

এক্কেবারে ছড়িয়ে ছত্রিশ!

তবে রাজনের সবচেয়ে বড় রসিকতাটা আমি আজও ভুলিনি, ভোলা সম্ভবও নয়।

২ অক্টোবর, ২০০৬

রাত দশটা নাগাদ ফোন এল। ওপ্রান্তে খুশি-খুশি গলা। খুব একচোট হেসে বলল, “রাবণটাকে (রাজনের বস) পটিয়েছি, বুঝলে? দু’সপ্তাহের জন্য আসছি। কালকের ফ্লাইটেই। তুমি প্ল্যান করে রাখো, কোথায়-কোথায় যাবে। এবার খুব বেড়াব, বেশটি করে বাইরে খাওয়াদাওয়া করব, আর সিনেমা দেখব। দিল্লির খানদানি আদবকায়দাও শিখেছি, সব দেখাব। প্ল্যান করে রেখো।”

প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছিলাম, ইয়ার্কি মারছে। জিজ্ঞেস করলাম, “সত্যি বলছ?”

“হান্ড্রেড পারসেন্ট। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই তুমি আমার চাঁদমুখ দেখবে। আই শ-প-থ।”

পরদিন সকালে কিন্তু ও এল না।

সারাদিন কেটে গেল, রাজন এল না।

সন্ধে গড়িয়ে গেল, তবুও না। বুঝে গেলাম, ব্যাপারটা ইয়ার্কিই ছিল। মনে-মনে রাগ করে বসে আছি। ভাবছি, দাঁড়াও আর-একবার ফোন করুক, হতভাগা!

রাতে ফোনটা এল। ওর নয়, ওর কোলিগের।

রাজা দোসরা অক্টোবর রাত এগারোটায় একটা ট্রাকের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। বাইকটা

boierpathshala.blogspot.com

ভেঙে চুরমার... তার আরোহী স্পট ডেড।

জন্ম: ২ মে, ১৯৭৬

মৃত্যু: ২ অক্টোবর, ২০০৬

এটাই ওর সবচেয়ে বড় রসিকতা।

... রগোঁ মেঁ দৌড়নে ফিরনে কা হাম নেহি কায়ল
জব আঁখ হি সে না টপকা, তো ফির লহু কেয়া হ্যায়।

মির্জা গালিব আমার বড় প্রিয়। বড় সত্যি কথা বলেন ভদ্রলোক।

ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

boierpathshala.blogspot.com